দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 1-4-MAY 2008 ...

প্রাইমারি শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন

ড. আনোয়ার হোসেন তালুকদার

এদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে মন্ত্রকৃত পুরাতন অবেজো শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন বিশেষ দেখা যায় না যদিও কয়েকটা শিক্ষা কমিশন এ ব্যাপারে কাজ করেছে। মেধা ও সময়ের অপচয় রোধ করার জন্য অবিলম্বে বিভিন্ন স্তরে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা ছাত্রদের পুরো শিক্ষা জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি যদি সুদৃঢ় ও মজবুত না হয়, তাহলে সারা শিক্ষাজীবনই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কিছু আলোকপাত করা হল।

ইংল্যান্ড ও আমেরিকার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছিল। এ সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল।

এদেশের পড়াশুনা করার জন্য বা পরীক্ষার সময় মুখস্থের বিষয়বস্তু মুখস্থ করতে হয়। কিন্তু উন্নত দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা মোটেই উৎসাহিত করা হয় না। কারণ এতে স্বাধীন চিন্তাধারা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং সৃজনশীলতা ব্যাহত হয়। সেদেশে ছোটবেলা হতে খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। এজন্য অনেক রকমের উপকরণ ও সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। কাঠের ব্লক, কাঠি, রবার, লোহা এবং প্লাস্টিকের জিনিস, বিভিন্ন রকমের ছবি ইত্যাদি দ্বারা শিশুরা স্কুলে বিভিন্ন রকমের খেলা করে থাকে এবং চিত্র আঁকে। এই খেলার মাধ্যমেই তারা সংখ্যা ও অক্ষরজ্ঞান লাভ করে কিন্তু সংখ্যাগুলো এবং অক্ষরগুলো মুখস্থ করানো হয় না। এরপর সহজ বই পড়তে দেয়া হয়। বই পড়া শিখতে পারলে, পড়ার বিষয়বস্তু লেখার অভ্যাস করা হয়। এভাবে পড়া ও লেখার মাধ্যমে শিশুদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই বয়সে বাড়িতে পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা নেই এবং পরীক্ষারও কোন প্রচলন নেই। ক্লাসে পর্যবেক্ষণ দ্বারা শিক্ষকগণ ছাত্রদের জ্ঞানের মূল্যায়ন করে থাকে। সেখানে স্কুলে পড়াশুনার ব্যাপারে শিক্ষকরা ছাত্রদের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয় না। বরং ছাত্রদের চিন্তা করার স্বাধীনতা, কথা বলা বা লেখার স্বাধীনতা এবং কাজের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয় যেন তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীলতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পদ্ধতিটা পুরো ছাত্রজীবনে ধরে চলতে থাকে। কর্মজীবনেও ইহার সুফল প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অবে শ্রেণীতে সকলসময়ই কোন শিক্ষক উপস্থিত থাকে এবং ছাত্রদেরকে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে থাকে। অবশ্য এ নির্দেশনা দেয়ার পদ্ধতি ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে শিক্ষকগণকে আগেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

শিশুদের শিক্ষার উপকরণ ও সামগ্রী তৈরি করার জন্য বিদেশে অনেক কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে। এই কারখানাগুলো থেকে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ সমস্ত উপকরণ আসে। এছাড়া শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য অনেক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য যথোপযুক্ত কারিকুলাম এবং পাঠ্য বই প্রকাশ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

কিন্তু এ দেশে ক্লাসে লেখাপড়া করার সময় ও পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন বিষয় মুখস্থ করতে হয়। তার ফলে মেধার অপচয় হয় এবং সৃজনশীলতার ক্ষতি হয়। তাছাড়া এভাবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করাই হয় এবং বৃথা সময়ক্ষেপণ করা হয়।

উপরোক্ত দুই রকমের শিক্ষা পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য বোঝানোর জন্য একটা বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করা যায়। গত বছর দশকে ইংল্যান্ডে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সময় আমার ছেলে-মেয়েরা সেখানে স্কুলে নিচের ক্লাসে পড়ত। একদিন দেখি ছোটটা প্রেতে অধ্যয়নরত বড় ছেলেটার একটা লেখা স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে। তখন বাসায় আমি তাকে একটা গল্প লিখতে বললাম। সে কিছুক্ষণের মধ্যে 'পাখি' সম্বন্ধে এক পৃষ্ঠার একটা লেখা লিখে দেখালো, অবশ্য ইংরেজীতেই। এটা সম্ভব হয়েছে সে দেশের উন্নত ধরনের লেখাপড়া পদ্ধতির জন্য। দেশে ফিরে কয়েক বছর পর সে যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে তখন বাংলায় একটা গল্প লিখতে বলায় সে তা লিখল না। এমনকি সেদিন সে যে যে কাজ করেছে সেটা লিখতে বলায় তাও লিখল না। এর কারণ হচ্ছে এই স্কুলে লেখার অভ্যাস করা হয় নাই বরং মুখস্থ করার ব্যবস্থা আছে। এই ঘটনা থেকেই বুঝা যায় এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা দুর্বল এবং গলদটা কোথায়।

বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে বইয়ের পড়া মুখস্থ না করে সৃজনশীল পরীক্ষার মাধ্যমে স্কুলের পরীক্ষাগুলো গ্রহণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু লেখাপড়া শুরুর প্রথম থেকেই ছাত্রদেরকে শ্রেণীকক্ষে স্বাধীন চিন্তাধারা এবং সৃজনশীলতার অনুশীলন করতে হবে। তাহলে পরবর্তী শিক্ষা জীবনে এগুলোর বিকাশ ঘটবে এবং ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা আসবে। কিন্তু বর্তমানে যেরকমভাবে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে, শিক্ষা জীবনের মাঝখান থেকে এরকম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ বিষয়ে মার্কিনভাবে ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

এ দেশের প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থা উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রথমে কয়েকটা প্রাইমারি স্কুল নিয়ে একটা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট (IER) -এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপ হতে পারে।

১। প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট স্কুলগুলোর শিক্ষকদেরকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার কারিকুলাম এবং সিলেবাস তৈরি করা এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই লেখা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে। ৩। শ্রেণীকক্ষের জন্য বিভিন্ন রকমের খেলার উপকরণ ও সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীতে এই খেলার সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন হবে বয়স অনুসারে। ৪। শ্রেণীকক্ষের মেঝেতে চিত্র অংকন সামগ্রী রাখতে হবে যেন শিশুরা মেঝেতে বসে চিত্রাংকন করতে পারে। চিত্রাংকন কল্পনা শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক। ৫। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের ফলে শ্রেণীকক্ষের বাইরে খেলাধুলা করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এটা চিত্তবিনোদনের জন্য এবং পড়াশুনার একঘেয়েমি দূর করার জন্য প্রয়োজন। ৬। শ্রেণীতে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণ ছাত্রদের শিক্ষার মান নির্ণয় করবে। এজন্য কোন পরীক্ষা নেয়া হবে না। শ্রেণীকক্ষে

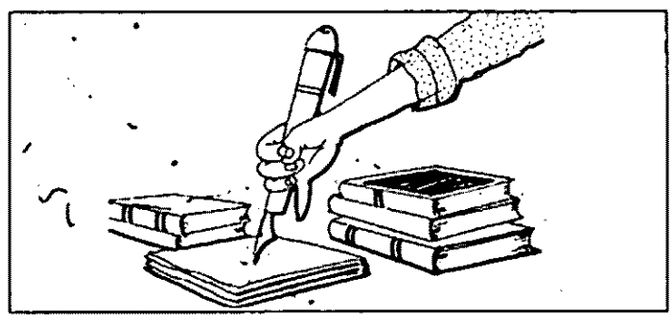

ভালভাবে শিক্ষাদান করতে পারলে বাড়িতে লেখাপড়ার প্রয়োজন হয়তো হবে না।

এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যায়ক্রমে আরো অনেক স্কুল এই প্রকল্পের আওতায় আনা যেতে পারে। এরকম প্রকল্পের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে এবং শ্রেণীকক্ষের জন্য খেলা ও অংকনের সামগ্রী তৈরি করার জন্য বিভিন্ন কারখানা গড়ে তুলতে হবে। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেসরকারিভাবেই এগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যেমনটা বিদেশে হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে এ উন্নয়নের সুবিধার জন্য এবং নানারকম পরামর্শ লাভের জন্য ইংল্যান্ডের বা আমেরিকার একটা ভাল প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ (Liaison) করার ব্যবস্থা যেতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এরকম একটি মৌলিক এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্য বিদেশী সাহায্যের অপেক্ষা হওয়ার কথা নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা করে বহুমুখী ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানেও মুখস্থ করাকে পরিহার করতে হবে এবং সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

[লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]